কবিতায় রচিত জীবন

হেলাল হাফিজের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার

সংকলন ও সম্পাদনা
রাকিবুজ্জামান লিয়াদ

ঐতিহ্য

আম্মা কিংবা আব্বা
হারানো কষ্টের ফেরিওয়ালাদের

সংকলন প্রসঙ্গে

প্রেসক্লাবের ভেতরে নিগূঢ় মৌনতা নিয়ে কম্পিউটারের মনিটরে মুখ গুজে আছে এক প্রৌঢ়। রুমের ভেতরে গিয়ে দেখি এ যে প্রৌঢ় নয়, একে প্রৌঢ় বলা পাপ! মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপাপের মতো। এ যে সেই জল, যে জলে আগুন জ্বলে! এ যে সেই যৌবন, যে যৌবন যুদ্ধে যাবার শ্রেষ্ঠ সময়! এ যে সেই যৌবন, যে যৌবন মিছিলে যাবার শ্রেষ্ঠ সময়!

কথা ছিল একটি পতাকা পেলে
আমাদের সব দুঃখ জমা দেবো যৌথ-খামারে,
সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক চাষাবাদে সমান সুখের ভাগ
সকলেই নিয়ে যাবো নিজের সংসারে।

অথবা

ইচ্ছে ছিল তোমাকে সম্রাজ্ঞী করে সাম্রাজ্য বাড়াবো
ইচ্ছে ছিল তোমাকেই সুখের পতাকা করে
শান্তির কপোত করে হৃদয়ে উড়াবো।

তাঁর লেখা কবিতাগুলো যেন একেকটি প্রেম আর দ্রোহের খনি। ভাষার এমন সুন্দর ব্যবহার, শব্দের এমন চমৎকার চয়ন, বিমোহিত করে তাবৎ কাব্যপ্রেমীকে। যিনি উদাসীন ছিলেন, কবিতাই তার প্রেম, তার সংসার। এই কবি কবিতাকে স্লোগান করেননি, তবে তার কবিতা স্লোগান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কবির কবিতায় যেমন আছে ব্যক্তির আবেগ অনুভূতি, প্রেম-বিরহ তেমনি আছে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আশাভঙ্গের কথাও। বাংলাভাষার একজন বিরল কবি হেলাল হাফিজ। তিনি আজকের মৌলিক কবি, নন্দিত কবি। যার লেখা কবিতার এক বড় এলাকা জুড়ে মর্মগ্রাহী দুঃখ ও বেদনার বিস্তার। মাতৃহীন ছিলেন বলেই বোধ হয় বেদনাবোধ এবং শূন্যতা হেলাল হাফিজকে কবি হওয়ার প্রণোদনা যুগিয়েছে। কবিতার জন্য তিনি ২০১৪ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ পেয়েছেন অনেক সাহিত্য পুরস্কার ও সম্মাননা। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, নিরহংকারী এবং নিভৃতচারী এক কুমার। জাতীয় জীবনে মুক্তি ও দ্রোহের আগুন ছড়ালেও ব্যক্তিজীবনে প্রচণ্ড অভিমানী এ মানুষটি জন্মাবধি নিজের সঙ্গেই কষ্ট ফেরি করে চলেছেন।

আজীবন করেছেন দুঃখের চাষাবাদ। বেদনাকে করেছেন নিজের বোন। দু'হাতে দুঃখ দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে তার জীবন। আর যেখানে দুঃখের কিছুটা কম পড়েছে, সেখানে নিজেই নিজের মতো করে দুঃখ বানিয়ে নিয়েছেন। তাঁর কথা–

'বেদনা আমার খুব প্রিয়। আমি মনে করি সুখ আমার জন্য অতটা জরুরি নয়। কারণ সুখ শিল্পের জন্যে তেমন কোনো প্রেরণা দেয় বলে আমি মনে করি না। শিল্পের জন্যে জরুরি হচ্ছে বিরহ, বিচ্ছেদ, বেদনা।'

এই বেদনার ফলেই যুগে যুগে সৃষ্টি হয়েছে সব অনবদ্য সাহিত্য। এই কষ্টের ফেরিওয়ালা তাই কষ্ট বিলিয়েছেন সারা জীবন। মানুষের ভেতরের বোধকে করেছেন জাগ্রত।

'এটা এমনই একটা আকালের দেশ, যেখানে নান্দনিক দুঃখ দেওয়ার মানুষের বড্ড অভাব। ফলে কিছু বেদনা, কিছু দুঃখ আমি নিজেই আমার ভেতর তৈরি করে নিয়েছি এবং চেষ্টা করেছি এই বেদনাকে শিল্পে রুপান্তরিত করার।'

এই কষ্ট তিনি ফেরি করেছেন মানুষের জন্য–

কষ্ট নেবে কষ্ট
হরেক রকম কষ্ট আছে
কষ্ট নেবে কষ্ট

কষ্টকে কতটুকু কাছ থেকে দেখলে, কতটুকু গভীরে গেলে তিনি এমন উপমা দিতে পারেন, 'পাথর চাপা সবুজ ঘাসের সাদা কষ্ট'। আবার কখনও কখনও কষ্টের ভারে তার দাঁড়িয়ে থাকাও হয়েছে কঠিন।

কে আছেন?
দয়া করে আকাশকে একটু বলেন–
সে সামান্য উপরে উঠুক,
আমি দাঁড়াতে পারছি না।

যখন রাজনৈতিক চরম নৈরাজ্য চলছে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদিনের মৌলিক বিশ্বাস। দেখছেন ক্ষমতার আর লোভের কাছে নতজানু হচ্ছে মূল্যবোধ। তিনি বলছেন গভীর ক্ষত নিয়ে :

যুদ্ধোত্তর মানুষের মূল্যবোধ পাল্টায় তুমুল,
নেতা ভুল,
বাগানে নষ্ট ফুল।

আজীবন কবিতাই লিখে গেছেন। প্রেমে পড়েছেন অসংখ্য নারীর। তার কবিতায় ব্যবহার করা নাম হেলেন, হিরণবালা, সাবিতা মিস্ট্রেস সবই বাস্তবের রমণী। তিনি লিখেছেন–

ভালোবেসেই নাম দিয়েছি 'তনা',
মন না দিলে
ছোবল দিও তুলে বিষের ফণা।

হারানোর সব ভয় হারিয়ে হেলাল হাফিজ কাব্যতীর্থে যাত্রা করলেন। ভয় তো তাকে ভয় পায়।

তিনি যে কেবল সাধারণ প্রেম করে যাবার বন্দনা করে গেছেন, তা নয়। তাই তো তিনি লিখেছেন,

মানবজন্মের নামে হবে কলঙ্ক হবে
এরকম দুঃসময়ে আমি যদি মিছিলে না যাই,
উত্তর পুরুষে ভীরু কাপুরুষের উপমা হবো
আমার যৌবন দিয়ে এমন দুর্দিনে আজ
শুধু যদি নারীকে সাজাই

বিদ্রোহ আর প্রেমকে তিনি মিলিত করেছিলেন এক বিন্দুতে। তিনি তাঁর 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়' কবিতাতেই বলেছেন,

কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনী হতে হয়।
যদি কেউ ভালোবেসে খুনী হতে চান
তাই হয়ে যান
উৎকৃষ্ট সময় কিন্তু আজ বয়ে যায়।

কবি হওয়ার তার কোনো ইচ্ছে ছিল না। ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু ডাক্তার হলে পড়াশোনার চাপে আর কবিতা লিখতে পারবেন না বলে ডাক্তারিতে ভর্তি হননি। পরে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। নিজের ভেতরকার হাহাকার মেটাতেই তিনি কবি হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই কবিতা দিয়ে তিনি টাকা পয়সা কামাতে চাননি। তার ভাষায়, 'সাহিত্য করে বা কবিতা দিয়ে আমি বিত্ত-বৈভব কামাতে চাইনি, আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল এই কবিতা দিয়ে আমি যাতে মানুষ কামাতে পারি। সবাই জমায় টাকা, আমি চাই মানুষ জমাতে !'

কবিতা লিখে মানুষের কাছে পৌঁছানো সহজ নয়। কিন্তু কবিরা এসব নিয়ে ভাবেন না, তোয়াক্কা করেন না। আপন মনে তাঁরা শব্দের মালা গেঁথে যান। চিরাচরিত এ পর্যালোচনা আপেক্ষিকভাবে সত্য হলেও কবি হেলাল হাফিজ ব্যতিক্রম। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'যে জ্বলে আগুন জলে' দিয়েই মানুষের হৃদয়ে আসন করে নিয়েছেন তিনি।

মানুষ জমিয়ে তিনি যখন খ্যাতির একেবারে শিখরে, তখনই তিনি চলে যান লোকচক্ষুর আড়ালে। এরপর আর কোনো বই প্রকাশ হয়নি অনেক বছর। কারণ

জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'খ্যাতির বিড়ম্বনা আছে।' তার এই অগোচরে চলে যাওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, তার কবিতা স্থায়িত্ব পাবে কিনা তা দেখার জন্যই এ কাজ।

শোক শক্তিতে পরিণত হয় বাণীতে। বেদনার গরলপানে হন নীলকণ্ঠ।

'পৃথিবীর তিন ভাগ সমান দু'চোখ যার
তাকে কেন এক মাস শ্রাবণ দেখালে!'

তাঁর কবিতা সাহসের পক্ষে কল্যাণকর, সমকাল সংকট যেমন উঠে আসছে কবিতায় তেমনি সংকট তীব্রতার প্রাচীর ভেঙে বিজয় আলিঙ্গনের পথ বাতলে দেয়া আছে।

কবিতার রাজপুত্র ও চিরকুমার কবি হেলাল হাফিজের জীবন, বিশুদ্ধ প্রেম আর মানুষ জমানোর গল্প নিয়ে বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের মুখোমুখি হয়েছেন। তারই অংশ আমরা সংকলন করেছি এই বইয়ে।

আশা করি বইটির মাধ্যমে কবির জানা-অজানা অনেকে বিষয় আমাদের সামনে আসবে।

প্রিয় কবি হেলাল হাফিজকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা, সাক্ষাৎকারের এই সংকলন প্রকাশে তাঁর সানন্দ-অনুমতির জন্য। হেলাল হাফিজের বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রিয় প্রকাশনা সংস্থা ঐতিহ্য'কে ধন্যবাদ, এমন একটি সংকলন প্রকাশে এগিয়ে আসার জন্য।

রাকিবুজ্জামান লিয়াদ
ফেব্রুয়ারি ২০২৪

সা ক্ষা ৎ কা র-সূ চি

‘পত্রিকায় আমি যা বেতন পেতাম, তার তিন-চার গুণ বেশি উপার্জন হতো তাস খেলে ।’ ১৩
‘দেশটা তো কোনো দলের নয়, দেশটা কোনো ব্যক্তিরও নয়’ ২৩
প্রেম নিয়ে প্রেমের কবি হেলাল হাফিজ ২৯
‘যে ভাষার মানুষ যত বেশি মুনশিয়ানার সঙ্গে কাজটা করতে পারে, সেই ভাষা তত উন্নত’ ৪১
‘প্রেম ছাড়া বিপ্লব হয় না’ ৪৫
‘সফলতার ভার বহন করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়’ ৫০
‘মাতৃহীনতার বেদনাই আমাকে কবি করে তুলেছে’ ৫৯
‘আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয় আলস্য, নারীর চেয়েও প্রিয়’ ৬৬
‘রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর ক্ষমতাই ছিল না যে তাকে বুঝবে’ ৭৮
‘বেদনা ছাড়া শিল্প সম্ভব নয়’ ৯৩
‘আমি একবার এক হিজড়ার প্রেমে পড়েছিলাম’ ১০০
‘আমার নিঃসঙ্গতা, অপূর্ণতা, অপ্রাপ্তি চেষ্টা করেছি শিল্পে রূপান্তর করার’ ১০৫
‘মানুষের মুখে আমার সৃজন নিয়ে বিতর্ক ভালো লাগে’ ১১৬
‘আমি কবিতার নেশায় মগ্ন একজন মানুষ’ ১৩৮
‘যাপিত জীবনের সবকিছু কবিতায় ধরতে চেয়েছি’ ১৪১
‘কবিতা দিয়ে মানুষ জমাতে চেয়েছি’ ১৪৭
‘একসময় তো জুয়া খেলাই ছিল আমার পেশা’ ১৫৪
‘কবি হলো স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম সত্তা’ ১৬৫
‘কবিতা কিন্তু বাঁচেই কবির জীবন খেয়ে, কবির জীবন খেয়ে জীবন ধারণ করে’ ১৮০
‘আমার স্বপ্নের দন্তস্যর নিচে ব-ফলা ছিল না’ ১৮৭

‘পত্রিকায় আমি যা বেতন পেতাম, তার তিন-চার গুণ বেশি উপার্জন হতো তাস খেলে ।’

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : আসাদুজ্জামান নূর

আসাদুজ্জামান নূর : সুধী দর্শক, ‘বেলা অবেলা সারা বেলা’ অনুষ্ঠানে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে আমরা এই অনুষ্ঠানে সেই সব দেশবরেণ্য মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি, যাঁরা তাঁদের প্রতিভার গুণে সৃজনশীলতার দীপ্তিতে উজ্জ্বল করেছেন আমাদের বাংলার মুখ। আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে যাঁকে পেয়েছি, তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি একজন কবি। যাঁর একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। একটি কাব্যগ্রন্থ দিয়ে তিনি যা জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, তা কিংবদন্তিতুল্য। একাধারে সাংবাদিকতা করেছেন দীর্ঘদিন। তিনি আমাদের প্রিয় মানুষ প্রিয় কবি হেলাল হাফিজ।

আমাদের এই অনুষ্ঠান একেবারেই ঘরোয়া পরিবেশে। গল্পগুজব করার মতো। তো আমরা শুরু করব একেবারেই আপনার জন্মলগ্ন থেকে। কোথায় জন্ম? কবে জন্ম বা আমরা যেটাকে বলি গ্রামের বাড়ি, সেটা কোথায়। আপনি সেসব সম্পর্কে বলুন।

হেলাল হাফিজ : নেত্রকোনা থেকে ১০-১২ মাইল দূরেই আমাদের গ্রামের বাড়ি, বটতলী। ওইখানে আমার জন্ম। কিন্তু শৈশব-কৈশোর এবং আমার প্রথম যৌবনের ওই সময়টা কেটেছে নেত্রকোনা শহরে। আমার আব্বা নেত্রকোনার সবচেয়ে বিখ্যাত স্কুল দত্ত হাইস্কুলের বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন। আমি নিজেও সেই স্কুলের ছাত্র ছিলাম।

আসাদুজ্জামান নূর : আপনার বাবার নাম?

হেলাল হাফিজ : আব্বার নাম ছিল খোরশেদ আলী তালুকদার। কিন্তু তাঁকে ওই অঞ্চলের সবাই পাগড়িওয়ালা স্যার বলে ডাকত। বাবার একটা শখ ছিল মাথায় পাগড়ি পরা।

আসাদুজ্জামান নূর : কিন্তু আপনি বললেন আপনার জন্ম গ্রামের বাড়ি, তার মানে কি নানার বাড়িতে জন্ম?

হেলাল হাফিজ : ওইটা দাদার বাড়ি। নানার বাড়িও, দাদার বাড়িও, কারণ, আব্বা বিয়ে করেছেন চাচাতো বোনকে।

আসাদুজ্জামান নূর : আপনার আম্মার নাম কী?

হেলাল হাফিজ : আমার আম্মার নাম কোকিলা খাতুন। উনি গৃহিণী ছিলেন, নানুর মুখে গল্প শুনেছি। আমি তো দেখিনি মাকে। দেখিনি মানে আমার তিন বছর বয়স তখন ছিল। তখন আমার আম্মা মারা যান। ওইভাবে স্মৃতিতে নেই। আমি আর আমার বড় ভাই আমাদের দুজনকে রেখে আম্মা মারা যান। কয়েক বছর পর আব্বা আবার বিয়ে করেন। ওই পক্ষের আছেন তিন বোন, দুই ভাই, অর্থাৎ আমরা চার ভাই, তিন বোন।

আসাদুজ্জামান নূর : শৈশবে মাকে হারিয়েছেন। তাহলে আপনার শৈশবে কীভাবে বেড়ে ওঠা, একটু বলবেন?

হেলাল হাফিজ : একটু অবহেলায় আমি বড় হয়েছি। একটু অনাদরেই। স্কুলজীবনে আমি ছিলাম খেলাধুলার মানুষ। ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, এমনকি লন টেনিস খেলাও শিখেছি। লেখাপড়ায় মন ছিল না, খেলাধুলার দিকে মন বেশি ছিল। তখনই আগ্রহবিমুখতা তৈরি হয়েছিল। সেই স্কুলজীবনেই আমি প্রথম প্রেমে পড়ি সবিতা মিস্ট্রেসের। তিনি আমার চেয়ে বয়সে ১২-১৩ বছরের বড় হবেন। তাঁকে দেখলেই আমার মায়ের মতো মনে হতো। আমার ভেতরে কিন্তু তখনো ফ্রয়েড ক্রিয়াশীল নয়। উনি অসম্ভব আদর করতেন আমায়। কখনো মনে হতো আমি তার ভাই। কখনো মনে হতো আমি তার ছেলে। কখনো মনে হতো আমি তার প্লেটোনিক প্রেমিক, বিশেষ করে আমি যখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি। তিনি কিন্তু সবই বুঝতেন, তবু অপার আনন্দে আমাকে লাগামহীন আশ্রয় দিয়েছেন। আমার অনেক প্রেমের কবিতার উনি নায়িকা।

আসাদুজ্জামান নূর : আপনি বলছিলেন পড়ালেখায় মন ছিল না, খেলাধুলায় বেশি মন ছিল। এর পাশাপাশি আর কী করতেন?

হেলাল হাফিজ : বাংলা কবিতা আবৃত্তি, ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, ক্রমাগত গল্পবলা– এগুলোতে অধিকাংশ সময় প্রথম হয়েছি, কখনো কখনো দ্বিতীয় হয়েছি।

আসাদুজ্জামান নূর : তার মানে তখন আপনি গল্প-কবিতার বই পড়া শুরু করে দিয়েছেন।

হেলাল হাফিজ : অসম্ভব পড়ছি। তখন শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' পড়েছি, 'গৃহদাহ' পড়ে ফেলেছি।

আসাদুজ্জামান নূর : আর কবিতা?

হেলাল হাফিজ : কবিতার কথা কী বলব, রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, আমাদের শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, আহসান হাবীব। এঁদের কবিতা আমি স্কুলজীবনে পড়ে ফেলেছি। কলেজজীবনে এসে আমি খোঁজ পেলাম জীবনানন্দ দাশের। তারপর যখন বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে এলাম, এখানে এসে আরেকজন কবি আমাকে খুব প্রভাবিত করলেন, তিনি আমাদেরই সমসাময়িক, অকালপ্রয়াত আবুল হাসান। নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গে আমার শৈশব থেকে পরিচয়।

আসাদুজ্জামান নূর : এই যে নেত্রকোনা শহরে আপনার বড় হয়ে ওঠা, আপনি বলছিলেন আপনার উদ্বাস্তু জীবন তখন থেকেই। উদ্বাস্তু জীবনে আর কী কী উপাদান ছিল?

হেলাল হাফিজ : সিনেমা দেখা ছিল, তার চেয়েও বেশি ছিল বাউলগান, বিচ্ছেদের গান সারা রাত ধরে হতো এবং আমি সারা রাত ধরে বসে বসে শুনতাম। যেহেতু নেত্রকোনা অঞ্চলটা লোকসংস্কৃতির একেবারে সূতিকাগার।

আসাদুজ্জামান নূর : আপনার স্কুলজীবন শেষ হলো কবে?

হেলাল হাফিজ : আমি এসএসসি দিয়েছি ১৯৬৫ সালে।

আসাদুজ্জামান নূর : রেজাল্ট ভালো হয়েছিল?

হেলাল হাফিজ : কোনোরকমে সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করলাম।

আসাদুজ্জামান নূর : তারপর কলেজ কোথায়?

হেলাল হাফিজ : নেত্রকোনায়। আরেকটা নতুন জীবনের শুরু। তখন মাথায় চাপল আমি ডাক্তার হব। সে জন্য আমি আইএসসিতে ভর্তি হলাম। বহু কষ্টে

আইএসসি পাস করলাম। '৬৭ সালে ঢাকায় এলাম। তখন কবিতাপোকা মাথার ভেতর ঢুকে গেছে।

আসাদুজ্জামান নূর : তার মধ্যে কি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে কোথাও?

হেলাল হাফিজ : বেশ কিছু কবিতা এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন লিটলম্যাগে, ঢাকার লিটলম্যাগে, ইত্তেফাকে। তখন মনে হলো যে যদি ডাক্তারিতে ভর্তি হই, তাহলে আমি কবিতায় সময় কখন দেব। তার চেয়ে বরং আমি বাংলায় ভর্তি হই। এ ভূখণ্ডের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদেরা বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন, বিভাগীয় প্রধান ডক্টর আবদুল হাই, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, তারপর আনোয়ার পাশা, রফিকুল ইসলাম, আহমদ শরীফ। ভর্তি হওয়ার কয়েক দিনের মাথায় বাড়িতে আব্বার সঙ্গে একটু মনোমালিন্য হলো। হঠাৎ কাগজে দেখিয়ে মুন্সিগঞ্জ হাইস্কুলে একজন আইএসসি পাস শিক্ষক নেবে। তারপর আমি সেখানে অ্যাপ্লিকেশন করি এবং এক বছর সেখানে শিক্ষকতা করি। পরের বছর আবার এসে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি। ইকবাল হলে আমার জায়গা হলো, গুণের জায়গা নেই, আবুল হাসানের থাকার জায়গা নেই। তারা দুজনেই অধিকাংশ সময় আমার রুমে থাকত। ঠিক তখন আমাদের ভেতরে কবিতা নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হলো। এমনও হয়েছে, একজনের কবিতা অন্যজন বালিশের নিচ থেকে চুরি করে একটু ঘষামাজা করে পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছে।

আসাদুজ্জামান নূর : তাতে কি মনোমালিন্য হয়নি?

হেলাল হাফিজ : হ্যাঁ, মনোমালিন্য হয়েছে, আবার সেটা অন্যভাবে পুষিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে আমাদের সাহিত্যজীবন শুরু হলো। সকালে নাশতার পয়সা থাকে না, দুপুরে খাবারের পয়সা থাকে না, অথচ না খেয়েও থাকি না। কেউ না কেউ খাওয়াচ্ছে। যেমন তৎকালীন 'দৈনিক পাকিস্তানে' গেলেই হয়তো হাসান হাফিজুর রহমান হাতে ১০ টাকা ধরিয়ে দিলেন গুণকে আর আমাকে। কিছু ছাত্রী ছিল, যেমন ক্যামেলিয়া মুস্তাফা, বেবী মওদুদ, তারা তো সচ্ছল। তারা সব সময় আমাদের টাকা দিয়ে সহযোগিতা করত। মনে আছে, হোটেলে খেয়ে দৌড় দিয়ে বেরিয়ে গেছি, পকেটে টাকা নেই। এসব কিছু করেছি আমরা কবিতার জন্য। সবাই টাকা জমায়, আমি মানুষ জমাতে চাই কবিতা দিয়ে।

আসাদুজ্জামান নূর : কিন্তু সেই তুলনায় তো আপনার গ্রন্থসংখ্যা কম, মাত্র একটা।

হেলাল হাফিজ : হ্যাঁ, আমার মৌলিক গ্রন্থ মাত্র একটা– *যে জলে আগুন জ্বলে*।

আসাদুজ্জামান নূর : এটা কেন?

হেলাল হাফিজ : তখন ২০০ বা ৩০০ কবিতার বই বের হতো। যেদিন মেলাটি শেষ হলো, তার পরের দিন একটি বইয়ের নামও কারো মুখে শোনা যেত না। কোনো কবিতার কথা শোনা যেত না। কোনো কবিতার একটি পঙ্‌ক্তিও শোনা যেত না। এইটা আমাকে খুব পীড়া দিত। তখন আমার ভেতরে একটা জেদ চাপল, আমার বইটি তখনই করব, যখন বইটি আর বেনোজলে ভেসে যাবে না। আমি ১৭ বছর লেখালেখির পর 'যে জলে আগুন জ্বলে' বের করেছি।

আসাদুজ্জামান নূর : আমরা বিশ্ববিদ্যালয়জীবনটা একটু শেষ করে আসি।

হেলাল হাফিজ : আচ্ছা। আমি বোধ হয় একমাত্র ছাত্র, যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে আট বছর ছিলাম। একটা কারণে থাকতে পেরেছি, 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়' কবিতা জন্য। এই কবিতাটি আমাকে রাতারাতি তারকাখ্যাতি এনে দিল। আহমদ ছফা এবং কবি হুমায়ুন কবির– এ দুজন। লেখক শিবির ছেলেমেয়েদের দিয়ে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে এই কবিতার প্রথম দুটি লাইন লিখিয়েছিল।

আসাদুজ্জামান নূর : এই কবিতাটা লেখার পেছনে কী ঘটনা ছিল?

হেলাল হাফিজ : এই কবিতা লেখার পেছনে মূল অনুপ্রেরণা হলো '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং একজনমাত্র মানুষের অঙ্গুলি হেলনে, বলাই বাহুল্য, তিনি শেখ মুজিবুর রহমান, যাঁর কথায় এই যে সাড়ে সাত কোটি মানুষ উঠছে-বসছে, তিনি কী বলছেন, তা শুনছে। যে মানুষটা, যাঁর হাতে সে পাইপটা, সফেদ পাঞ্জাবি, হয়ে আকাশটা মাথায় লেগে যাবে। এই বিষয়টি নিয়ে আমি তিন পঙ্‌ক্তির একটি কবিতা লিখেছি।

আসাদুজ্জামান নূর : শুনি, বলুন।

হেলাল হাফিজ : 'কে আছেন? দয়া করে আকাশকে একটু বলেন, সে সামান্য ওপরে উঠুক, আমি দাঁড়াতে পারছি না।'
শেখ মুজিবকেই মানায় এই কবিতা।

আসাদুজ্জামান নূর : এই যে জনপ্রিয়তা, তার মাঝে কি প্রেমও এসেছিল?

হেলাল হাফিজ : প্রেমের প্রথম অংশটা একটু বাদ পড়ে গেছে, সেখানে শুধু আমি সবিতাদির কথা বলেছি। সে সময় আমার সমবয়সী একটি মেয়ের সঙ্গেও একটু নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যার উল্লেখ আমার কবিতাতেও আছে, যার নাম হেলেন। বিরহ পেয়েছি, কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু সে কষ্টকে আমি শিল্পে রূপান্তর করেছি।

আসাদুজ্জামান নূর : ফিরে যাই আবার পেছনের দিকে। গণ-অভ্যুত্থানের '৭০ নির্বাচন। ধীরে ধীরে আমরা স্বাধীনতার দিকে যাচ্ছি। ৭ মার্চের ভাষণ, ২৫ মার্চ। এই কালরাতের কথা বলুন।

হেলাল হাফিজ : ভাত খাওয়ার জন্য বুয়েট ও ঢাকা মেডিকেলের মাঝখানে পপুলার রেস্টুরেন্ট ছিল। আমি সেখানে খেতে গেলাম। লুঙ্গি পরা, একটা হাফশার্ট গায়ে। এই ভাত খেয়ে আমি একটা রিকশা পেলাম সামনে, আমার নেত্রকোনার এক বন্ধু হাবীবুল্লাহর সাথে দেখা। ও রিকশায় উঠে বলল, আমাকে একটু ফজলুল হক হলে রেখে আসো। ওর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় না। তার সঙ্গে রুমে গেলাম, গল্প করলাম। তখন এদিকে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। ভয়াবহ গোলাগুলি। সারা রাত গেল। পরদিন সকালে কারফিউ। ২৬ মার্চ সারা দিন রুম থেকে বের হতে পারলাম না। ২৭ তারিখ কারফিউ উইথড্র হলো। আমি বেরিয়ে আমার হলে এলাম। আমার রুম যেহেতু তালামারা ছিল। ভেতরে ঢুকে ব্যাগ গুছিয়ে ফেলছি বের হওয়ার জন্য।

আসাদুজ্জামান নূর : তখন হলের অবস্থা কেমন ছিল?

হেলাল হাফিজ : অবস্থা কী বলব, মাঠে ধরেন ৩৫-৫০টার মতো লাশ পড়ে আছে। তার মধ্যে চিশতী হেলালুর রহমানও আছে। আমি গেটে পা রেখেছি, তখনই দেখি নির্মলেন্দু গুণ। দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না। আমাকে জীবিত দেখবে সে ভাবেনি। ওই দিনই গুণ আর আমি এবং একজন তৃতীয় বন্ধু ছিল, আমরা তিনজন নদী পেরিয়ে কেরানীগঞ্জ হয়ে, জিঞ্জিরায়

আমাদের এক বন্ধু ছিল, তার বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। সেখানে ছয় দিন ছিলাম।

আসাদুজ্জামান নূর : তার পরের সময় কোথায় ছিলেন?

হেলাল হাফিজ : ছয় দিন পর জিঞ্জিরায় আক্রমণ হলো। জিঞ্জিরা থেকে আবার ঢাকায় চলে এলাম। এসে বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রডিউসার বেলাল বেগের বাসায় উঠলাম। পরদিন সকালবেলায় খেয়ে মমিনুল হক নামের আরেক প্রডিউসার ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে ১০০ টাকা ধার নিয়ে বেলাল বেগ আমাদের হাতে দিয়ে বললেন, পেছনের দিকে তাকাবেন না, সোজা চলে যান আপনারা, যেদিকে পারেন। আমি উঠলাম গিয়ে পুরান ঢাকায় বড় ভাইয়ের এক শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়ের বাসায়। বড় ভাই তখন শাহীন স্কুলের টিচার। ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো। তখন তিনি বললেন, তুই এখন নেত্রকোনায় চলে যা। নেত্রকোনায় চলে গেলাম। কিছুদিন সেখানে থাকার পর আব্বাকে বললাম, 'আব্বা, আমি আবার ঢাকায় চলে যাব, বড় ভাই যেহেতু ঢাকায় আছে।' হলে তো আর উঠতে পারব না, কারণ, হলের অবস্থাও ভালো না। এই আমি ঢাকা চলে এলাম বড় ভাইয়ের কাছ।

আসাদুজ্জামান নূর : পুরো সময়টাই আপনি ঢাকায় থেকে গেলেন? আপনার কোনো সমস্যা হয়নি?

হেলাল হাফিজ : হ্যাঁ, আমি ঢাকায় থেকে গেলাম। কোনো সমস্যা হয়নি। কারণ, আমি ঘর থেকেই তো বের হইনি।

আসাদুজ্জামান নূর : এর পরের ঘটনাটি কী হলো? মানে দেশ স্বাধীন হওয়ার সময়টা।

হেলাল হাফিজ : ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো। ১৮ তারিখে আমি হলে চলে এলাম, ইকবাল হলে।

আসাদুজ্জামান নূর : আপনি পেশাগত জীবনে প্রবেশ করলেন কবে?

হেলাল হাফিজ : একদিন রব ভাই আমাকে বলল, 'তুই কিছু একটা কর, কোনো কাজে ঢোক।' আমি বললাম, আমি কী করব, ভাই? আমি তো কিছু জানি না। ভাই আমি সাংবাদিকতা করতে চাই। আপনি এখন "দৈনিক বাংলা" অথবা "দৈনিক পূর্বদেশে" আমার জন্য একটু কথা বলে দেন। আপনি